

মুখতাসার যাদুল মা'আদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদ সমুহের সূচী ও বিবরণ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহঃ)

যদি এমন করতাম, তাহলে এমন হত, যদি এমন না করতাম, তাহলে এমন হতনা- এ ধরনের কথা বলা নিষেধ

কোন কিছু অর্জন করতে ব্যর্থ হলে তিনি এ কথা বলতে নিষেধ করেছেন যে, যদি এমন করতাম তাহলে এমন হত। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে 'যদি' কথাটি শয়তানের কাজকে সহজ করে দেয়। তিনি এর চেয়ে উত্তম কথা শিক্ষা দিয়েছেন এবং এ কথা বলার আদেশ দিয়েছেন যে, **وَمَا شَاءَ فَعَلَ** এটি ছিল আল্লাহর ফয়সালা, তিনি যা চান তাই করেন। কেননা মানুষের কথা, আমি যদি এ রকম করতাম, তাহলে এ বস্তুটি আমার হাত ছাড়া হতনা, এমনটি না করলে আমি এই বিপদে পড়তামনা। এ জাতীয় কথায় কোন উপকার নেই। কেননা যা চলে গেছে তা পুনরায় ফেরত আসবেনা এবং 'যদি' কথাটি ব্যবহার করে ভবিষ্যতেও কোন উপকার পাওয়া যাবেনা।

মানুষ মনের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় স্থির ও নির্ধারণ করে, তা যদি সেভাবেই সংঘটিত হয় তাহলে এমন জিনিষ সংঘটিত হওয়াকে আবশ্যিক করবে যা আল্লাহর নির্ধারণের (তাকদীরের) বাইরে। অথচ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ের বিপরীত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং মিথ্যা, মূর্খতা এবং অসম্ভব বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই এ রকম চিন্তার উদ্ভব হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাকদীরকে অস্বীকার করার দোষ থেকে মুক্ত হলেও 'যদি' বলার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবেনা।

যদি বলা হয় 'যদি' কথাটি বলার মাধ্যমে যে সমস্ত বিষয় কামনা করছে, তাও তো তাকদীরেই নির্ধারিত? উত্তরে বলা হবে যে, এ কথা সঠিক। কিন্তু নির্ধারণকৃত অপছন্দনীয় বিষয়টি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে বললে লাভ হত। সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর তা বললে অপছন্দনীয় বিষয়টি দূর হবেনা বা তার প্রভাব কমানোও সম্ভব নয়। বরং এ অবস্থায় বান্দা ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে, যার মাধ্যমে সে অপছন্দনীয় বিষয়টি দূর করতে পারবে এবং তার ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো কমানো সম্ভব হবে। যা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়, তা সংঘটিত হওয়ার আশা করাতে কোন লাভ নেই। কেননা এটি শুধু অপারগতার দিকেই নিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা অপারগতা-অক্ষমতা প্রকাশ করাকে অপছন্দ করেন এবং সতর্কতা অবলম্বন ও কর্মঠ হওয়াকে ভালবাসেন। যা করলে কল্যাণের পথ খুলবে তিনি তা করার আদেশ দিয়েছেন। আর **لَوْ** (যদি) বলা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা শয়তানের কাজকেই সহজ করে দেয়। কেননা উপকারী কাজ করা থেকে বিরত থাকলে বান্দা বাতিল ও অস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে ধাবিত হয়। এই জন্যই নাবী (ﷺ) অপারগতা-অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। এ দু'টিই সকল অকল্যাণের দ্বারকে উন্মুক্ত করে। এ থেকেই দুশ্চিন্তা, হতাশা, পেরেশানী, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণগ্রস্ত হওয়া, পুরুষদের পরাজয় ইত্যাদি দোষণীয় বিষয়ের সূচনা হয়। এ সবার উৎস হচ্ছে অপরসূতা-অক্ষমতা ও অলসতা। আর **لَوْ** (যদি) কথাই এই পথের সূচনা করে।[1]

যে ব্যক্তি কাজ করেনা এবং শুধু আশা-ভরসা করে বসে থাকে, সেই সবচেয়ে বেশী দরিদ্র ও অক্ষমে পরিণত হয়। অক্ষমতা-অপারগতা থেকেই সকল পাপ কাজের সূচনা। কেননা অক্ষমতা প্রকাশ করেই বান্দা সংকাজ করার রাস্তা থেকে দূরে থাকে এবং যে সমস্ত পন্থা তার মাঝে এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা

এবং পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার উপায়-উপকরণ অবলম্বন করাও বর্জন করে। পরিণামে সে অপরাধের সাগরে পন্মাবিত হয়। এ জনাই নাবী (ﷺ) উপরোক্ত হাদীস শরীফে ('যদি' কথাটি বলা নিষিদ্ধ করার হাদীছে) অন্যায়ের সকল শেকড়, শাখা, সূচনা, প্রবেশ পথ এবং সকল উৎস একত্রিত করেছেন। এই হাদীস আটটি খারাপ অভ্যাসকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রত্যেক দু'টি অভ্যাস পরস্পর সম্পৃক্ত। নাবী (ﷺ) দু'আয় বলতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

“হে আল্লাহ, আমি উদ্ভিগ্ন হওয়া, বিষগ্ন হওয়া, অক্ষম হওয়া, অলসতা করা, কৃপণতা করা, ভীরা হওয়া, এবং ঋণের আধিক্য এবং পুরুষদের অন্যায় প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[2]

হাম্ম ও হুগ্ন অর্থাৎ উদ্ভিগ্ন হওয়া ও বিষগ্ন হওয়া পরস্পর সম্পৃক্ত। এ দু'টি একসাথেই আপতিত হয়। কেননা অন্তরে যে অপছন্দ আপতিত হয় তা হয়ত অতীতে কোন বস্তু হারানোর কারণেই হয়। আর এটিই হুগ্ন তথা বিষগ্নতার সৃষ্টি করে অথবা ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে আর এটিই উদ্ভিগ্নতার জন্ম দেয়। বিষগ্নতা ও উদ্ভিগ্নতা আসে অপসূতা-অক্ষমতা থেকে। যে বস্তু অতীতে হাত ছাড়া হয়ে গেছে বা যে বিপদ হয়েছে তা দুশ্চিন্তার মাধ্যমে ফেরত আসবেনা বা এর মাধ্যমে কোন বিপদ দূর হবেনা। বরং তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহর প্রশংসা করা, ধৈর্যধারণ করা এবং তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে মেনে নিতে হবে এবং এ কথা বলার মাধ্যমে যে, اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ অর্থাৎ এটি ছিল আল্লাহর ফয়সালা, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেছেন।

ভবিষ্যতে যে অপছন্দনীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, উদ্ভিগ্ন হওয়ার মাধ্যমে তা দমন করা যাবে না। বরং তা দূর ও দমন করার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তা দূর করার জন্য কৌশল নির্ধারণে কখনই অক্ষমতা ও অপসূতা প্রকাশ করবেনা। আর যদি এমন হয় যে, কৌশল অবলম্বন করেও তা দূর করা সম্ভব নয়, তাহলে হতাশা ও বিরক্তি প্রকাশ করা যাবেনা। বরং তাওহীদ, তাওয়াক্কুল এবং সুখে-দুঃখে আল্লাহকে প্রভু হিসাবে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে সকল বিপদাপদ বরদাস্ত করতে হবে। দুশ্চিন্তা-বিষগ্নতা ও উদ্ভিগ্নতা মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে ফেলে, অন্তরকে রেসূক্রান্ত করে দেয় এবং বান্দা ও কল্যাণকর কাজের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দুশ্চিন্তা ও উদ্ভিগ্নতা কল্যাণের পথে চলতে আগ্রহীর পিঠে বিরাট এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার হিকমতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, তিনি এই দুটি শত্রুকে (দুশ্চিন্তা-বিষগ্নতা ও উদ্ভিগ্নতাকে) আল্লাহ বিমুখ এবং তাঁর ভালবাসা ও ভয় থেকে শূণ্য অন্তরসমূহের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে তিনি এর মাধ্যমে অন্তরসমূহকে বিপদগ্রস্ত করে তাঁর বান্দাদেরকে অনেক নাফরমানী পাপাচারিতা থেকে বিরত রাখতে পারেন।

তাওহীদের প্রশস্ত ময়দানে না আসা এবং আল্লাহমুখী না হওয়া পর্যন্ত অন্তরগুলো সর্বদা দুশ্চিন্তা ও উদ্ভিগ্নতার কষ্টের বন্ধীখানায় আটকে থাকে। এই বন্ধীশালা ও দুঃখ-ক্লেশ থেকে বের হয়ে আসার জন্য অন্তরের সামনে তাওহীদের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই এবং একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত উদ্ভিগ্ন লক্ষ্যে পৌঁছারও কোন সুযোগ নেই। আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্যে আল্লাহর সাহায্য জরুরী। তা ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়, আল্লাহ ব্যতীত সেই পথ দেখানোর জন্য অন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই, তিনি ছাড়া সৎকাজের তাওফীক দাতা ও অন্যায় কাজ থেকে বাধা দানকারী অন্য কেউ নেই।

আল্লাহ্ যখন তাঁর কোন বান্দাকে কোন স্থানে রাখেন তখন তিনি স্বীয় ইচ্ছা ও বিশেষ হিকমতের কারণেই সেখানে রাখেন। বান্দাকে কোন হক থেকেই আল্লাহ্ বঞ্চিত করেন না। যদি কোন কোন ক্ষেত্রে বঞ্চিত করেনও তাহলে উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দা যাতে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কাজসমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে তা অর্জন করার চেষ্টা করে, তারই ইবাদত করে এবং তাঁর সামনেই নত হয়। পরিণামে আল্লাহ্ তাকে উহা দান করেন। আল্লাহ্ কখনও তাঁর বান্দাকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কোন কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকেন, তাকে সম্মানিত করার জন্য অপমানিত করেন, তাকে ধনী করার জন্য তাঁর দিকে মুখাপেক্ষী করেন, তাকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁর সামনে তাকে দুর্বল করেন, ভাল ও মূল্যবান পদ থেকে অপসারণের মাধ্যমে তাকে স্বীয় বন্ধুত্বের পদে অধিষ্ঠিত করেন এবং বঞ্চিত করার তিক্ততা আস্বাদন করানোর মাধ্যমে তার দরবারে বিনয়ী হওয়ার স্বাদ উপভোগ করান। সুতরাং আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর বান্দাকে বঞ্চিত করাও দান, তার শাস্তি হচ্ছে শিক্ষা এবং শত্রুকে তার উপর শক্তিশালী করা বান্দাকে তাঁর দিকেই পরিচালনা করার অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ্ স্বীয় দানের পাত্র ও হকদার সম্পর্কে অধিক অবগত আছেন এবং স্বীয় রিসালাত রাখার পাত্র সম্পর্কেও অধিক জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

“আর এভাবেই আমি কিছু লোককে অন্য কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি- যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন?[3] আল্লাহ্ তা'আলা দান করার জন্য উপযুক্ত কিংবা অনুপোযুক্ত স্থান ও ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। আল্লাহ্ কাউকে বঞ্চিত করলে সে যদি আল্লাহর দিকে ফেরত আসে তাহলে এটিই উক্ত বান্দার জন্য দান হিসাবে পরিগণিত হয়, কাউকে দান করার কারণে যদি সে বিপথগামী হয় তাহলে সে প্রকৃত পক্ষে (আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত থেকে) বঞ্চিত হল।

সুতরাং যে সব বিষয় ও বস্তু বান্দাকে আল্লাহ থেকে দূরে রাখে তা মূলতঃ তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি স্বরূপ আর যেসব বিষয় তাকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী করে সেগুলো তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত স্বরূপ। যদিও তা দুনিয়ার কোন নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে হয়।

আল্লাহ্ চেয়েছেন যে, বান্দা আমল করবে। আর সে কখনও আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত আমল করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তিনি আমাদেরকে সঠিক পথে থাকার আদেশ দিয়েছেন এবং সেই পথে টিকে থাকার মাধ্যম গ্রহণ করারও উপদেশ দিয়েছেন। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, এই উদ্দেশ্যটি (বান্দার আমল) ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ না তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ও কার্য সম্পাদনে সহায়তা করবেন এবং আমাদের দ্বারা কাজটি সম্পাদিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবেন। সুতরাং দু'টি ইচ্ছা থাকতে হবে। একটি হচ্ছে বান্দার ইচ্ছা। বান্দা কাজ করার ইচ্ছা করবে। অন্যটি হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর ইচ্ছা এই যে, তিনি তার বান্দাকে কাজ করতে সাহায্য করবেন। আল্লাহর এই ইচ্ছা ব্যতীত বান্দার পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“তোমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পারনা”।[4] সার কথা হচ্ছে নাবী (ﷺ) দৃষ্টিভঙ্গি-বিষয়তা ও উদ্ভিদ হওয়া থেকে আশ্রয় চেয়েছেন। এ দু'টি হচ্ছে পরস্পর বন্ধ। আর তিনি অক্ষম-অপারগতা প্রকাশ করা থেকেই আশ্রয় চেয়েছেন। এরাও পরস্পর সম্পৃক্ত। কেননা বান্দা সংশোধন ও সফলকাম

না হতে পারলে তা কখনও তার শক্তি ও ক্ষমতা না থাকার কারণেই হয়ে থাকে। আর এটিকেই বলা হয় অক্ষমতা-অপারগতা। আবার কখনও সংশোধন ও সফলকাম হওয়ার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু সে সফলকাম হতে ইচ্ছা করেনা। এটিকেই বলা হয় আলস্য। এ দু'টি খারাপ অভ্যাসের কারণেই সকল প্রকার কল্যাণ ছুটে যায় এবং সকল অকল্যাণ চলে আসে। এই অকল্যাণের কারণেই মানুষ তার শারিরীক শক্তি থাকতেও তার দ্বারা উপকৃত হতে পারেনা। এটিকেই বলা হয় কাপুরুষতা। এই কারণেই মানুষের সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তা দ্বারা উপকৃত হতে পারেনা। তা হচ্ছে কৃপণতা। এ থেকেই দু'টি কর্তৃত্ব তৈরী হয়। একটি হচ্ছে কারও হকের উপর নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এটিই হচ্ছে ঋণের আধিক্য। আরেকটি হচ্ছে অন্যায়ভাবে মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এটিই হচ্ছে মানুষের উপর দু'টি পুরুষদের প্রাধান্যতা ও কর্তৃত্ব। এই সবগুলোই অপারগতা ও অক্ষমতার ফলাফল। এ অর্থেই সহীহ হাদীছে নাবী (ﷺ) এর সেই কথা ব্যবহৃত হয়েছে, যা তিনি এমন ব্যক্তির জন্য বলেছেন, যার বিরুদ্ধে ফয়সালা করা হয়েছিল। এতে সেই লোকটি বলেছিল-

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমার পক্ষে কাজ করার জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার”। নাবী (ﷺ) তখন বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা অক্ষম ও অপারগ হওয়াকে দোষারোপ করেন। তোমার উচিত ছিল বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কর্মট হওয়া এবং নিজের অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা করা। চেষ্টা করার পরও যদি পরাজিত হয়ে যাও তখন বলঃ

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমার পক্ষে কাজ করার জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার”। এই ব্যক্তি বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করেই এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ না করেই কথাটি বলেছে। এতে করে বিচার ফয়সালা বা রায় তার বিরুদ্ধে গিয়েছে। সে যদি স্বীয় হক প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করত এবং যথাযথ দলীল-প্রমাণ পেশ করত, যুক্তি দিয়ে কথা বলত তাহলে রায় তার পক্ষে যেত। উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার পর এবং বিজয়ী হওয়ার প্রচেষ্টা চালানোর পর পরাজিত হয়ে কথাটি বললে তা আসল স্থানে বলা হয়েছে বলে বিবেচিত হত। ইবরাহীম (আঃ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য সমস্ত উপায় ও কৌশল গ্রহণ করেছেন এবং কোন প্রচেষ্টাই তিনি বাদ দেন নি। অতঃপর যখন শত্রুরা তাঁর উপর জয়ী হল এবং তারা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করল তখন তিনি বললেন-

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমার পক্ষে কাজ করার জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার”। তাই তাঁর কথা যথাস্থানে প্রয়োগ হয়েছিল এবং তাঁর কথাটি বলার সাথে সাথেই ফল দিয়েছে। এমনি রসূল (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণকে উহুদ যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পর যখন বলা হল যে,

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

“তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়েছে সুতরাং তাদের ভয় কর” (সূরা আল ইমরান-৩:১৭৩) তখন সাহাবীগণও প্রস্তুতি নিলেন। অতঃপর তারাও কাফেরদের মুকাবেলা করার জন্য বের হলেন এবং বললেন-

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; আর আমাদের পক্ষ থেকে কাজের জন্য তিনিই উত্তম জিন্মাদার”।[5] তাদের এই কথা সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে হওয়ার কারণে পরিপূর্ণ প্রভাব ও ফলাফল দেখা দিয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট”।[6] সুতরাং যে আল্লাহর উপর ভরসা করবে, আল্লাহ্‌ তার জন্য যথেষ্ট। এখানে তাকওয়ার পর তাওয়াক্কুল তথা ভরসার কথা বলা হয়েছে। তাকওয়া হচ্ছে আসবাব তথা এমন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা, যা গ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর তা গ্রহণ করার পর ভরসা করলে আল্লাহ্‌ সাহায্য করবেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন-

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত”।[7] সুতরাং প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যয় করা ছাড়াই ভরসা করা এবং সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহকেই যথেষ্ট মনে করা শুধু ব্যর্থতা ও অক্ষমতারই নামান্তর। যদিও এখানে আল্লাহর উপর ভরসা করার বিষয়টি প্রস্তুতি হচ্ছে তথাপিও এটি হচ্ছে অক্ষম-অপারগতার তাওয়াক্কুল (ভরসা)। সুতরাং বান্দার উচিত নয় যে, সে তার ভরসাকে অক্ষমতায় পরিণত করে এবং অপারগতাকে ভরসায় পরিণত করে নেয়। বরং আল্লাহর উপর ভরসাকেও যেন ঐ সমস্ত উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত মনে করে, যার সবগুলো একসাথে ব্যয় না করলে লক্ষ্যবস্তু অর্জিত হয়না। এই মাসআলায় মানুষের দু'টি দল ভুল করেছে। একদল মনে করেছে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করাই যথেষ্ট। তাই তারা আল্লাহর নির্দেশিত কাজ সম্পাদন করা বর্জন করেছে, যা উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যম ছিল। সুতরাং তারা অলসতা ও অক্ষমতা-অপারগতার দোষে দূষিত হয়েছে। পরিশ্রম বিহীন ভরসাকে তারা শক্তিশালী মনে করার পরও আল্লাহর উপর তাদের ভরসা দুর্বল হয়েছে। যখনই পরিশ্রম বিহীন ভরসা শক্তিশালী হবে তখনই অলসতা তার কাজের স্পৃহাকে দুর্বল করে দিবে। যেই কর্মটি ছিল ভরসার মহল (স্থান)।

যেই কৃষক যমীনে চাষ করে এবং তাতে বীজ বপন করে এবং ফসল উৎপন্ন হওয়াতে আল্লাহর উপর ভরসা করে সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং তাওয়াক্কুলের হক আদায় করে। সে যমীনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়ে আল্লাহর ভরসাকে নষ্ট করে দেয়না। এ রকমই হওয়া উচিত পথ চলার সাথে সাথে আল্লাহর উপর মুসাফিরের ভরসা। আল্লাহর শাস্তি হতে রেহাই পাওয়া এবং তাঁর ছাওয়াব অর্জনের মাধ্যমে সফলকাম হওয়ার জন্য আল্লাহর আনুগত্যে সর্বদা শ্রম ব্যয় করার সাথে সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করা জরুরী। এটিই হচ্ছে ঐ তাওয়াক্কুল, যার ফলাফল পাওয়া যায় এবং এভাবে যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করেন। অলস ও অক্ষম ব্যক্তির ভরসা আদৌ কোন ফল বয়ে আনেনা। আল্লাহও তাকে সাহায্য করেন না।

দ্বিতীয় বিভ্রান্ত দলটি হচ্ছে, যারা উপায়-উপকরণ ও পরিশ্রমের উপরই সম্পূর্ণরূপে ভরসা করেছে। তাদের (বাস্তবাদীদের) বিশ্বাস হল পরিশ্রমই একমাত্র সফলতার চাবি। তারা আল্লাহর উপর ভরসা করা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ। এই দলটি যদিও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রচুর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু তারা আল্লাহর উপর ভরসাকারীদের ন্যায় শক্তিশালী নয়, তাদের জন্য আল্লাহর কোন সাহায্য নেই এবং তাদের বিপদাপদও তিনি দূর করেন না। বরং আল্লাহর উপর ভরসা ছেড়ে দেয়ার কারণে এই দলটি দুর্বল ও অক্ষমে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলেই (ভরসাতেই) প্রকৃত শক্তি। কোন কোন সালাফ বলেছেন- যে ব্যক্তি সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী হতে চায় সে যেন আল্লাহর উপর ভরসা করে। তাই আল্লাহর উপর ভরসাকারী শক্তিশালী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত।

মোটকথা নাবী (ﷺ) বান্দাকে এমন বিষয়ের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে রয়েছে তার পরিপূর্ণ সফলতা এবং তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি। সুতরাং এই সফলতা অর্জনের প্রচেষ্টা করা উচিত এবং এ জন্য শ্রম ব্যয় করা জরুরী। তাহলেই হাসবীয়াল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল বলা উপকারী হবে। কিন্তু যে অলসতা করবে এবং অক্ষমতা প্রকাশ করবে ও লক্ষ্যবস্তু অর্জনের সুযোগ চলে যাওয়ার পর

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমার পক্ষে কাজ করার জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার” এ কথা বলবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। এই অবস্থায় তাকে আল্লাহ সাহায্য করেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি আমল করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর উপর ভরসা করে তিনি তাকেই সাহায্য করেন।

ফুটনোট

[1]. (যদি) শব্দ ব্যবহারের হুকুমঃ লাও শব্দটি দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। (১) অতীতে হাত ছাড়া হয়েছে এমন জিনিসের জন্য বিষম্ব, চিন্তিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে কিংবা অতীতে সংঘটিত কোন দুর্ঘটনার জন্য আফসোস করে এবং তাকদীরের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে লাও শব্দটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। যেমন কেউ বললঃ আমি যদি এমন করতাম তাহলে এমন হত, এমন না করলে এমন হতনা, সেখানে না গেলে আমি দুর্ঘটনার কবলে পড়তাম না ইত্যাদি। এ ধরনের কথা বলতে নাবী সাঃ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكْ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই-বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জেহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে তারা মারা যেতনা, আহতও হতনা। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন।” (সূরা আল-ইমরান-৩:১৫৬) এই আয়াতে বর্ণিত যেভাবে লাও (যদি) ব্যবহার করা হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেভাবে তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেনঃ আল-ইমরান-৩:৩

وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

তোমার কোন বিপদ হলে তুমি এ রকম বলো না যে, যদি এমন করতাম তাহলে এমন হত। বরং তুমি বল যে

قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ এটি ছিল আল্লাহর ফয়সালা, তিনি যা চান তাই করেন। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে ‘যদি’ কথাটি শয়তানের কাজকে সহজ করে দেয়। অর্থাৎ তোমার কাছে দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও বিষণ্ণতা চলে আসে। এতে তোমার ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। তুমি জেনে রেখো যে, তুমি যা অর্জন করেছ, তা হারানোর ছিল না। আর যা তুমি অর্জন করতে পার নি, তা তোমার পাওয়ার ছিল না। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা তাগাবুন-৬৪:১১) আয়াতের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেনঃ সেই প্রকৃত মুমিন, যে বিপদে আক্রান্ত হওয়ার সময় বিশ্বাস করে, উহা আল্লাহর পক্ষ হতেই। অতঃপর সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং তাকদীরের লিখন মেনে নেয়। (২) লাও (যদি) ব্যবহারের দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, উপকারী ইলম বর্ণনা, এবং কল্যাণকর কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য ‘লাও’ ব্যবহার করা জায়েয। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

“যদি নভোমন্ডল ও ভূ-লে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র”। (সূরা আশ্বীয়া-২১:২২) আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। এই কথাটি শিক্ষা দেয়ার জন্য এখানে লাও ব্যবহার করা হয়েছে। নাবী সাঃ বলেনঃ মুসা আঃ যদি আরও সবুর করতেন তাহলে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্য তাদের আরও ঘটনা বর্ণনা করতেন। সুতরাং নাবী সাঃ এখানে হতাশা ও আফসোস অর্থে লাও (যদি) কথাটি ব্যবহার করেননি। বরং তিনি ধৈর্য ও সবুরের প্রতি তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করেছেন। মুসা আঃ সবুর করলে আরও অনেক কল্যাণকর বিষয় জানা যেত।

[2]. বুখারী, কিতাবুত দাওয়াত, বুখারী, তাও. হা/৬৩৬৯, ইফা. ৫৮১৬, আপ্র. ৫৯২৩, সহীহ আত তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪৮৪, মিশকাত, হা/ ২৪৫৮, সহীহ, আলবানী রহঃ)।

[3]. সূরা আনআম-৬:৫৩

[4]. সূরা তাকবীর-৮১:২৯

[5]. সূরা আল ইমরান-৩:১৭৩

[6]. সূরা ত্বলাক-৬৫:২-৩

[7]. সূরা মায়িদা-৫:১১

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3868>

হাদিসবিডিৰ প্রজেক্টে অনুদান দিন